সর্পাঘাতের চিকিৎসা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ,

— নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ —

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০০১

ধর্ম্মার্থ শুল্ক ১·০০] [মাশুলাদি স্বতন্ত্র

নিবেদন

বিগত বাংলা ১৩৪০ সালের ২২শে ভাদ্রের "সঞ্জীবনী" পত্রিকার মধ্যবর্ত্তিতায় এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত অমিয়কান্তি মহাভারতী মহাশয় শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবকে অনুরোধ করেন, সর্পাঘাত ও বৃশ্চিক-দংশনের চিকিৎসা সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণন করিতে। তদনুসারে ধারাবাহিক ভাবে এক প্রবন্ধ "সঞ্জীবনী"তে প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবনীর পুরুষ-সিংহ সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় এই প্রবন্ধ সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহবান্ ছিলেন।

"সঞ্জীবনী"তে এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর হইতে ভারতের বহু প্রদেশ হইতে বঙ্গভাষা-ভাষী সজ্জনদের নিকট হইতে প্রবন্ধটী পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য আগ্রহসূচক পত্র আসিতে থাকে। তদুপরি, "সঞ্জীবনী"র শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র মহাশয়ও বিশেষ ভাবে উৎসাহ প্রকাশ করেন। তাঁহারই অর্থানুকুল্যে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

দীর্ঘকাল পুস্তিকাখানা অপ্রকাশিত ছিল। সম্প্রতি সর্ব্বসাধারণের আগ্রহে ইহা সামান্য সংশোধনান্তে "প্রতিধ্বনি" পত্রিকায় (ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩৫৯) পুনঃ প্রকাশিত হয়। এই চতুর্থ সংস্করণ তাহারই পুনর্মুদ্রণ।

মহাভারতী মহাশয় অনুরোধ না করিলে এবং "সঞ্জীবনী"-সম্পাদক মহাশয় প্রকাশ না করিলে, এই গ্রন্থের সৃষ্টিই হয়ত হইত না। পত্রপ্রেরকগণ আগ্রহসূচক পত্র না দিলে এবং শ্রদ্ধেয় সুকুমার বাবু প্রথম সংস্করণ নিজ ব্যয়ে প্রকাশ না করিলে হয়ত ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিতই হইত না। তাই, উল্লিখিত মহজ্জনেরা সকলেই আমাদের ও সর্ব্বসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ইতি—১লা বৈশাখ, ১৩৮৭ বাংলা।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী-১

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

অবতরণিকা

আমার পরহিতব্রত পুণ্যশ্লোক পিতামহ স্বর্গীয় হরিহর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ত্রিপুরার অন্তর্গত চাঁদপুর মহকুমাতে ওকালতি করিতেন। রেললাইন হইবার পূর্ব্ব হইতেই মেহার, চন্দ্রনাথ, সীতাকুণ্ড, আদিনাথ, উদয়পুর, কামরূপ প্রভৃতি তীর্থের যাত্রী, পাদচারী সাধু সজ্জনেরা ইঁহার গৃহে বিশ্রামার্থ অপেক্ষা করিতেন এবং সমগ্র জীবনে এক লক্ষের উপর সাধু-সন্তের সেবা ইনি করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই সব মহাত্মাদের মধ্যেই কেহ তাঁহাকে সর্পাঘাতের চিকিৎসা-প্রণালী শিক্ষাদান করেন। জীবৎকালে তিনি বোধ হয়

চারি পাঁচ হাজার সর্পদষ্ট রোগীর চিকিৎসা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতিপয় রোগীর মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া শরীর কাঠ হইয়া গিয়াছিল। আমার বাল্যকালে এইরূপ দুইটী রোগীর পুনর্জ্জীবন লাভ আমিই দেখিয়াছি। একজন হইতেছে, আবদুল গফুর নামক জনৈক ঘরামি, দ্বিতীয় ব্যক্তি—ঐ মহকুমার জনৈক সাহা। গফুরের চিকিৎসাকালে আমি উপস্থিত ছিলাম না, কিন্তু পূর্ব্বদিন হইতে সে মরিয়া আছে, এই সংবাদ শুনিয়া পিতামহ ছুটিয়া গেলেন, ইহা দেখিয়াছি এবং পরবর্ত্তীকালে গফুরকে জীবিত অবস্থায়ও দর্শন করিয়াছি। শেষোক্ত ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায়ও দর্শন করিয়াছি এবং পিতামহের তিন চারি ঘন্টা শ্রমের পরে তাহার ঠোঁট-মুখ নড়িতেছে, ইহাও দেখিয়াছি এবং পরবর্ত্তীকালে সেই ব্যক্তিকে চাঁদপুর কোর্টে মামলা-মোকদ্দমা করিতে আসিতে দেখিয়াছি। মোট কথা, যে চিকিৎসা-পদ্ধতি এই পুস্তিকায় বর্ণিত হইবে, তাহার সফল পরীক্ষা বহু স্থলেই হইয়া গিয়াছে।

পিতামহের নিকট হইতে এই বিদ্যা বংশের প্রায় সকলেই আয়ত্ত করেন। আমিও এই বিদ্যার প্রয়োগ বহুস্থলে করিয়াছি এবং আমার চিকিৎসিত রোগী একটিও মরেন নাই। মৃত অবস্থার রোগী আমি কখনও পাই নাই, কিন্তু জ্ঞানরহিত হইয়া গিয়াছেন, এমন রোগী আমি চিকিৎসা করিয়াছি। এই চিকিৎসা-প্রণালী অত্যন্ত শ্রমসাধ্য বলিয়া ১৩৩১ সালে

রোগে ভুগিয়া উঠিবার পর হইতে আমি স্বয়ং আর চিকিৎসা করি না। অবশ্য যে কেহ ইচ্ছা করিলে আমার নিকট ইহার কৌশল শিক্ষা করিতে পারেন। এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার পরে সর্পাঘাত রোগীর চিকিৎসার জন্য বহু দাবী আসিতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়াই আমি পুনরায় নিবেদন করিতেছি যে, আমি নিজ হস্তে এই রোগীর চিকিৎসা করিতে শারীরিক ভাবে আর সমর্থ নহি।

বিষ-পরীক্ষা

সর্পাঘাতের চিকিৎসার প্রথম কথাই হইল বিষ-পরীক্ষা। ইহা সর্পবিষ কি না এবং সর্পবিষ বা তজ্জাতীয় কোনও প্রাণীর (যথা বৃশ্চিকের) বিষ হইয়া থাকিলে রোগীর শরীরে কতটা স্থানে ইহার ব্যাপ্তি ঘটিয়াছে, তাহা আগে জানিয়া লওয়া দরকার। সর্পাঘাত চিনিবার সাধারণ উপায় হইল যে, আঘাতের স্থানে সাপের বিষদন্তের চিহ্ন থাকে এবং চিন্ চিন্ করিয়া এক অব্যক্ত যাতনা দষ্টস্থান হইতে ক্রমশঃ উৰ্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে। এই ঝিন্‌ঝিনানি কাহারও কাহারও শরীরে এত প্রবল হয় যে, তদ্দরুণ সংজ্ঞালোপের ভাবও প্রকাশ হইতে দেখা যায়। বিষধর সর্পেরা সামান্য একটু ক্ষত করিয়াই তাহাতে বিষ ঢালিয়া দেয়, এজন্য ক্ষতস্থানে অনেকগুলি দন্তের দাগ বা ক্ষত অত্যন্ত বেশী পরিমাণ স্থানে দেখা গেলে বিনা

ক্লেশেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহা ঢোঁড়া প্রভৃতি বিষহীন বা অল্পবিষ সর্পের দংশন হইতে পারে। অত্যন্ত বিষাক্ত সর্পের দংশন মাত্র অল্পকাল মধ্যে রোগীর শরীরে অবসন্নতা, মস্তিষ্কে উষ্ণতা, কণ্ঠের শুষ্কতা, প্রবল পিপাসা ও সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্মোদগম হইতে থাকে, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সর্পবিষ যতটুকু স্থানে বিস্তারিত হইয়াছে, ততটুকু স্থানের চর্ম্ম শীতল ও ঘর্ম্মোদ্গমে অশক্ত হইয়া থাকে। প্রায়ই বিষাচ্ছন্ন অংশের চর্ম্ম বিবর্ণ ও কাল্‌চে রং-এর হইয়া যায়। কিন্তু এই সাধারণ লক্ষণ দ্বারা চিকিৎসা বা রোগীর প্রাণ-রক্ষার ব্যবস্থা করা চলে না। এইজন্য দুইটী বিশেষ পরীক্ষার প্রয়োজন।

তাম্রখণ্ডের পরীক্ষা

প্রথম পরীক্ষা,—একটুকরা তাম্রখণ্ডের দ্বারা। তাম্রটুকু বিশুদ্ধ হওয়া চাই, ইহার সহিত অন্য ধাতুর যেন সংস্রব না থাকে। আমরা পূজার ঘরের কোষ-ছিপ বা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের পয়সা দ্বারা এই পরীক্ষা করিয়াছি। শরীরের যে স্থানে স্পর্শ করাইলে রোগী উষ্ণ বোধ করিবে, বুঝিতে হইবে, বিষ সেখানে নিশ্চিত আছে। তাম্রখণ্ডের স্পর্শে যে স্থান শীতল মনে হইবে, সেই স্থানে বিষ এখনো সংক্রমণ করে নাই বলিয়া জানিতে হইবে। যদি কোনও স্থানে তাম্রখণ্ড স্পর্শের পরে রোগী শীতল বা উষ্ণ ঠিক্ করিয়া

নির্দ্দেশ করিতে না পারে, তবে বুঝিতে হইবে, এই স্থানে বিষের প্রভাব আসিয়া পৌছিয়াছে এবং অত্যল্পকাল মধ্যে বিষ এখানে পূর্ণরূপে উপস্থিত হইবে।

একবার দুইবার স্পর্শ করিয়াই বিষের সঠিক সংস্থান নির্ণয় করা সম্ভব নহে, প্রত্যেক চিকিৎসকের এই বিষয় বিশেষভাবে স্মরণে রাখা উচিত। সর্পাঘাতের রোগীরা শতকরা প্রায় নব্বই জনই অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়া থাকে, ইহা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। ভীতি-বিহ্বলতা বশতঃ তাম্রস্পর্শের শৈত্য বা উষ্ণতা বিষয়ক রোগীর উপলব্ধি ও মতামত সত্যানুযায়ী হয় না। এজন্য বারংবার নানাস্থানে তাম্রখণ্ড স্পর্শ করাইয়া বিশেষ ধীরতা ও বিচক্ষণতার সহিত বিষের সংস্থান জানিয়া লইতে হয়। এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যে, রোগীর পরস্পর-বিরোধী কথায় নির্ভর করিয়া চিকিৎসা শেষ করিয়া আসিবার পাঁচ সাত ঘণ্টা পরে রোগী একেবার অচেতন হইয়া পড়িয়াছে এবং সামান্য বিচক্ষণতার অভাবের প্রায়শ্চিত্ত চারি পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী পরিশ্রমের দ্বারা করিয়া রোগীর শরীরস্থ বিষ পুনরায় অনেক শ্রম করিয়া নির্ম্মূল করিতে হইয়াছে।

জিকা ছালের পরীক্ষা

দ্বিতীয় পরীক্ষা,—জিকা গাছের সদ্যঃকর্ত্তিত বল্কল দ্বারা। জিকাকে ঢাকাতে কাপিলা, ত্রিপুরায় কামিলা, কামাল্লা, কাইমাল্লা, নোয়াখালীতে কাইমাল্লা বা বদীজ, চট্টগ্রামে বাদী,

বৰ্দ্ধমানে ও হুগলীতে জিওল, হাওড়া ও চব্বিশ পরগণাতে জিওল বা জিয়স্ বলে। এই বৃক্ষের ডাল কাটিয়া সাধারণতঃ বেড়ার জন্য রোপণের প্রথা আছে এবং তাহা শতকরা একশতটিই বাঁচিয়া যায়। প্রসিদ্ধি আছে যে, ইহার আগার দিক নীচের দিকে পুতিয়া রাখিলে, এই ডালই আমড়া গাছে পরিণত হয়। শেষোক্ত প্রবাদটীর সত্যতা নিজে পরীক্ষা করিবার অবসর পাই নাই, কিন্তু কুমিল্লার উকিল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন সাহা একটী আমড়া-জাতীয় পত্র-বিশিষ্ট গাছ দেখাইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে, উহা তাঁহার স্বহস্তে উল্টা করিয়া রোপিত জিকা ডালের রূপান্তর। জিকা গাছে এক প্রকার আঠা হয়, এই আঠা দ্বারা খাম প্রভৃতি আঁটিবার প্রথা অনেক দেশেই আছে। বেতের ফলের মত আকারে জিকার ছোট ছোট ফল গুচ্ছে গুচ্ছে হয় এবং বনে-জঙ্গলে সেই বীজ হইতেই জিকার বংশবৃদ্ধি হয়। জিকা গাছ পুরাতন হইলে ইহার সার দিয়া অতি দীর্ঘস্থায়ী খুটি হয়, যাহা কাদায়, নোনায় বা উই পোকাতে নষ্ট করিতে পারে না। আশা করি, এতখানি বিবৃতির পরে জিকা গাছ চিনিতে অধিকাংশ পাঠকেরই কোনও কষ্ট হইবে না।

জিকা গাছের একখানা তাজা বল্কল কাটিয়া লইয়া কৰ্ত্তিত অংশ দ্বারা রোগীর শরীর স্পর্শ করাইলে বিষাচ্ছন্ন স্থানে রোগী উষ্ণ অনুভব করিবে এবং বিষহীন স্থানে শীতল বোধ হইবে। এই স্থানে উল্লেখ করা খুবই আবশ্যক যে, কোনও কোনও রোগীতে

জিকা গাছের বাকলের পরীক্ষা সন্তোষজনক না হওয়ায় তাম্র-খণ্ডের পরীক্ষাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া আমার উপলব্ধ হইয়াছে।

এই ভাবে বিষ পরীক্ষা করিয়া বিষের সংস্থান সম্পর্কে একেবারে নিঃসংশয় হইয়া রোগীর শরীরে ডুরি বাঁধিতে হয়। বলাই বাহুল্য, বিষ পরীক্ষাকালে যতটা সম্ভব সত্বর কার্য্য করা কর্ত্তব্য। নতুবা অত্যন্ত বিষাক্ত সর্পের বিষ অতি অল্পকাল মধ্যেই সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে। হাতে কামড়াইলে যতক্ষণ বিষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তারিত না হইতে পারে এবং পায়ে কামড়াইলে যতক্ষণ বিষ কটিদেশ ছাড়াইয়া না যাইতে পারে, ততক্ষণই বিনা উদ্বেগে চিকিৎসা সম্ভব। ইহার ঊর্দ্ধে বিষ সঞ্চারিত হইবার পরে প্রায়ই রোগী হয় অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে বা সংজ্ঞাহীন হয়। এজন্যই ক্ষিপ্রকারিতা একান্তভাবেই আবশ্যকীয়।

সর্প-বিষের প্রকৃতি

সর্প-বিষের প্রকৃতিই এই যে, ইহা ব্যবায়ী। অর্থাৎ চর্ম্মের নিম্ন ভাগ দিয়া ইহা সঞ্চরণ করে। চর্ম্মোৎভিন্ন সূচিকাবেধের (Subcutaneous Injection)এর ন্যায় ইহা ধীরে ধীরে প্রথমতঃ চর্ম্মতল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই বিষয়ে অন্য সর্ব্বপ্রকার বিষের প্রকৃতির সহিত সর্প-বিষের প্রকৃতি একেবারে

পৃথক্‌। মাত্র ধুস্তুর-বিষের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। ধুস্তুর-বিষও প্রথমতঃ চর্ম্মের নীচ দিয়া নিজ বিক্রম প্রকাশ করে। ধীরে ধীরে সর্ব্বাঙ্গের চর্ম্মতল বিষাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে পরে সর্প-বিষ শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার সহায়তায় সমগ্র শরীরকে এবং শরীরের ভিতর-বাহিরে প্রত্যেক অণুপরমাণুকে প্রভাবিত করে।

মৃত্যু ও মৃতকল্প অবস্থার পার্থক্য

ঠিক এই অবস্থাটী আসিয়া গেলে সেই রোগীর মৃত্যু হইয়া গিয়াছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে এবং প্রকৃত মৃত্যু ঘটিবার পরে তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করার কোনও আশা বা সম্ভাবনাই আর থাকে না। কিন্তু হৃৎপিণ্ডকে আচ্ছন্ন করিবার পর হইতে সমগ্র শরীরের প্রত্যেক অণুপরমাণুকে বিষের দ্বারা সম্যক্‌ আচ্ছন্ন করিয়া বাস্তব মৃত্যু ঘটাইতে যে সময়টুকু প্রয়োজন হয়, তাহার দৈর্ঘ্য অধিকাংশ স্থলেই বাহাত্তর ঘণ্টা হইতে একশত আটষট্টি ঘণ্টা অর্থাৎ তিন দিবস হইতে এক সপ্তাহ কাল। এই সময়টুকু রোগী মরে না, প্রাণ তার নির্জ্জন কারাকক্ষে বন্দী দুর্ভাগ্য আসামীর ন্যায় চর্ম্মচক্ষের অগোচরভাবে অতি সঙ্কুচিত অবস্থায় তাহার সর্ব্বপ্রকার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির পরিচয়-বিরহিত ভাবে দেহ-মধ্যে নিতান্ত আড়ষ্ট হইয়া অবস্থান করে এবং দেহে শীতলতা, বিবর্ণতা, শ্বাস-প্রশ্বাস-বিহীনতা প্রভৃতি মৃত্যুর যাবতীয় পরিজ্ঞাত লক্ষণই প্রকাশ পায়। কিন্তু প্রকৃত মৃত্যুর সহিত এই

মৃতস্মন্য অবস্থার পার্থক্য এই যে, প্রকৃত মৃত্যু ঘটিলে শরীরস্থ পেশীসমূহে কোনও কাঠিন্য বিরাজ করে না, নাসাপথে বা মুখপথে পচনশীলতা হেতু তরলায়িত মস্তিষ্ক-মজ্জা গলিয়া পড়িতে থাকে এবং গুহ্য-পথে মলপাত বা উপস্থপথে বিকৃত ধাতুর ক্ষরণ লক্ষিত হয়, এবং টান দিলে অনায়াসে মস্তকের কেশকলাপ ও অঙ্গের রোমাবলি আল্‌গা হইয়া উঠিয়া আসে, কিন্তু মৃতস্মন্য অবস্থায় প্রবল আক্ষেপ-গ্রস্ত আকস্মিক মূর্চ্ছা-রোগীর ন্যায় সর্পদষ্ট রোগীর দেহটা একখণ্ড কাঠের মত অনড়ভাবে পড়িয়া থাকে, শরীরস্থ পেশীসমূহ কঠিন হইয়া যায়।

লাক্ষণিক এই পার্থক্যের দ্বারা মৃত ও মৃতস্মন্য অবস্থার তারতম্য নির্দ্দেশ করা যায় এবং বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা যথার্থ মৃত ব্যক্তির চিকিৎসা পরিহার করিয়া থাকেন।

মৃত ব্যক্তিকে দগ্ধ বা সমাধিস্থ করা নিষিদ্ধ কেন?

সর্পাহত মৃত ব্যক্তিকে অগ্নিতে দাহ বা মৃত্তিকায় সমাহিত করিতে নাই, পরন্তু একটী কলাগাছের ভেলায় চড়াইয়া মশারি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিবার যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যদি রোগী সত্য সত্যই মরিয়া গিয়া না থাকে, তবে ভাগ্যক্রমে কোনও সুচিকিৎসক গুণী ব্যক্তির দয়ায় কোথাও না কোথাও গিয়া পুনর্জ্জীবিত হইলেও হইতে পারে। অতএব দগ্ধ করিয়া বা সমাধিস্থ করিয়া তাহার পুনর্জ্জীবনের সুদূর সম্ভাবনাটুকুকে বিলুপ্ত করা

উচিত নহে এবং শকুনি-গৃধিনী প্রভৃতি মাংসাশী খেচরবৃন্দ যেন এই দেহের অনিষ্ট করিতে প্রলুব্ধ না হইতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের দৃষ্টিপথকে অবরুদ্ধ করিবার জন্য মশারির আচ্ছাদনও প্রয়োজন।

মৃতম্মন্যা গর্ভবতীর চিকিৎসা

মৃতম্মন্য অবস্থায় প্রায় অধিকাংশ রোগীই আরোগ্য লাভ করিতে পারে, কিন্তু গর্ভবতী স্ত্রীলোককে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা যায় নাই। পুনঃ পুনঃ সংজ্ঞা লাভ করিয়াও ইহারা আবার মৃত্যুর মুখে ঢলিয়া পড়ে। অনুমান করা হইয়া থাকে যে, গর্ভস্থ ভ্রূণের চর্ম্মতলেও বিষের সঞ্চরণ ঘটিয়া থাকে বলিয়া রোগিণীর চর্ম্মতল হইতে সমগ্র বিষ অপসারিত করিবার পরে ভ্রূণ শিশুর চর্ম্মতল হইতে রক্ত চলাচলের সহিত বিষ বিসর্পিত হইয়া গর্ভিণীকে পুনরাক্রমণ করে। ভ্রূণের অঙ্গ হইতে বিষকে অপসারিত করিবার কোনও প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয় নাই। অতএব চিকিৎসকের শ্রম বারংবারই পণ্ড হইতে থাকে। তথাপি আমাদের মনে হয়, প্রকৃত মৃত্যুর লক্ষণ সম্পূর্ণ প্রকাশ না পাইয়া থাকিলে, শ্রম বারংবার ব্যর্থ হইতে চাহিলেও মৃতম্মন্যা গর্ভিণীর চিকিৎসা চলা একান্তই কর্ত্তব্য, যেহেতু এই ভাবে চেষ্টা চলিতে চলিতে দৈবক্রমে কোনও অভিনব কৌশল আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে। ভবিষ্যৎকালে অগণিত গর্ভবতী সর্পদষ্টার জীবন-সম্ভাবনা আবিষ্কারের আশায়, পণ্ডই

হোক আর ব্যর্থই হোক, শ্রম স্বীকার করিতে কৃপণ হওয়া কোনও চিকিৎসকের কর্ত্তব্য নহে।

সর্পদংশনের চিকিৎসা যাদুবিদ্যা নহে

যে চিকিৎসা-প্রণালী আমি পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাসমূহে প্রকাশ করিব, তাহা যে কোন সবল সুস্থ ব্যক্তি অতি সহজেই অবলম্বন করিয়া বহু বিপন্নের উপকার করিতে পারিবেন। যাহা যাদুবিদ্যার ন্যায় গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় কেবলি গুপ্তভাবে প্রচারিত হওয়ার দরুণ ক্রমশঃ হীনাঙ্গ ও ক্ষীণকায় হইতে হইতে গ্রাম্য অশিক্ষিত কুসংস্কারগ্রস্ত তথাকথিত ওঝার অর্থহীন ফুৎকারমাত্রে পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে, তাহাই অকপট প্রচারের ফলে আমার অপেক্ষাও যোগ্যতর ব্যক্তিদের অনুশীলনের শক্তিতে পুষ্ট হইয়া একটা সত্যকার চিকিৎসা-বিজ্ঞানে পরিণত হইতে পারে। কারণ, গ্রাম্য ওঝার চিকিৎসাও একটা বৈজ্ঞানিক কার্য্য-কারণ-পরম্পরার ভিত্তিতেই জাত, যদিও ওঝারা তাহা জানেন না। কিন্তু বর্ত্তমানকালের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সর্পবিষ-চিকিৎসার মূলসূত্রটুকু ধরিতে পারা মাত্র ইহা হইতে নানা নবাবিষ্কারের সম্ভাবনা খুঁজিয়া বাহির করিতে সাহসী হইবেন। ছাগ-শরীরে সর্পবিষের সংক্রামণের Vaccine প্রস্তুত করিয়া তৎসহায়ে সর্পাঘাত চিকিৎসার অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কৃত হইতে পারে বলিয়া এক সংস্কার দিনের পর দিন আমার মনোমধ্যে পুষ্টিলাভ করিতেছে। কিন্তু উপযুক্ত

Laboratory করিতে না পারায় আমি আমার অধিকাংশ চেষ্টাকেই যথোচিত পরীক্ষা দ্বারা সাফল্য-সঞ্চয়ের সুযোগ দিতে পারি নাই এবং আমি অপ্রার্থী অযাচক বলিয়া সে সুযোগ শীঘ্র হইবে বলিয়াও আশা করা চলে না। বিশেষ করিয়া ধর্ম্ম-প্রচারই সম্প্রতি আমার প্রধান কার্য্য হওয়াতে আমার অবসর হইবার নহে। কিন্তু আমার সামান্য অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ অর্থবান্ কোনও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি নিজেই পরীক্ষার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে জগতের উপকার হইতে পারে, এই আশাতেই আমি সম্পূর্ণরূপে অকপট হইব।

ডোর-বন্ধন

সর্পবিষ কতখানি ব্যাপ্তি পাইয়াছে. তাহার পরীক্ষা হওয়া মাত্রই ডোর বাঁধা আবশ্যক, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শরীরের যতখানি ঊর্দ্ধ্বদেশ পর্য্যন্ত বিষ সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা হইতে পাঁচ সাত অঙ্গুলী বা স্থল-বিশেষে এক বিঘত উপরে, ডোর বাঁধিতে হয়। ঠিক সঞ্চরণ-স্থানের অব্যবহিত উপরে ডোর বাঁধিলেও চলে, কিন্তু বিষের সংস্থিতি বিচারে ভ্রমত্রুটি বিচিত্র নহে বলিয়া সাবধানতার হিসাবে কিছু উপরেই ডোর বাঁধা উচিত। কারণ, একটী রক্তকণিকার এক লক্ষ অংশের এক অংশও যদি সর্প-বিষের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং সেই রক্ত-কণিকাটি যদি চিকিৎসকের অনবধানতা প্রযুক্ত

ডোরের ঊর্দ্ধে থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ডোরের নিম্নাংশে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে বিষ-মোক্ষণ হইয়া গেলেও ঐ একটী মাত্র বিষাক্ত রক্তকণিকা হইতে পুনরায় সর্ব্বশরীরে বিষ বিসর্পিত হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটাইতে পারে।

বাহুমুলের বা কোমরের উর্দ্ধে সর্পদংশন হইলে কি করণীয়

কিন্তু হাতে বা পায়ে না কামড়াইয়া বাহুমূলের উর্দ্ধে বা কোমরের উর্দ্ধে সাপে কাটিলে ডোর বাঁধা চলে না। পেটে, বুকে বা গ্রীবায় ডোর বাঁধিলেও তাহা দ্বারা রক্তের উর্দ্ধগতি রুদ্ধ করিবার জন্য যতটা কষিয়া বাঁধা দরকার, ততটা কষিয়া বাঁধন দিলে, বন্ধনেই (যথা গ্রীবায়) রোগীর প্রাণাত্যয় ঘটিতে পারে। ঐ সব স্থলে ডোর প্রথমেই না বাঁধিয়া ঝাড়িবার প্রক্রিয়া দ্বারা, বিষকে বন্ধনোপযোগী স্থানে নামাইয়া লইয়া বিষের সংস্থিতি পুনরায় বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া তৎপরে বন্ধন করা উচিত। পায়ের বিষ নাভির উর্দ্ধে এবং হাতের বিষ বাহুমূলের উর্দ্ধে চলিয়া গেলে তখন দুইজন সমকক্ষ চিকিৎসক যদি একযোগে শরীরের সম্মুখ ভাগে এবং পশ্চাদ্ভাগে ঝাড়িবার প্রক্রিয়া চালাইতে থাকেন, তবে অতি সহজে ও অল্পায়াসে বিষকে বাহুমূলের নীচে বা কটি-দেশের নিম্নে নিয়া নামান যাইতে পারে। তৎপরবর্ত্তী চিকিৎসা একজনেই অনায়াসে করিতে পারেন।

ডোর তৈরীর উপাদান

বিষের ঊর্দ্ধগতি অবরুদ্ধ করিবার জন্য যে ডোর বাঁধিতে হয়, তাহা যে-কোনও জিনিষের তৈয়ারী নাতিস্থূল বা নাতিসূক্ষ্ম দড়ি হইতে পারে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইলে চাপের চোটে চামড়া কাটিয়া যাইতে পারে, আবার বেশী স্থূল হইলে উপযুক্ত ভাবে চাপ না পড়িতে পারে, এজন্য এই ডোর সিকি ইঞ্চি অপেক্ষা স্থূল এবং অর্দ্ধ ইঞ্চি অপেক্ষা সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক। একেবারে নূতন পাট হইতে যখন-তখন দড়ি পাকাইয়া ডোর বাঁধার নিয়ম গ্রাম্য ওঝাদের মহলে প্রচলিত আছে। কিন্তু দড়ির নূতনত্ব বা পুরাতনত্বের সহিত বিষ-নিরোধের কোনও সম্পর্ক নাই, সম্পর্ক হইতেছে চাপের দৃঢ়তার সহিত।

———

বিষ নামাইবার ডোর

বিষের ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধ করিবার জন্য যেমন ডোর বাঁধা প্রয়োজন, তেমনি আবার উক্ত ডোর বাঁধা হইবার পরে বিষটাকে নির্দ্দিষ্ট একটা স্থানে নিয়া জড় করিবার জন্যও একটী ডোর বাঁধিতে হয়। সর্ব্বাঙ্গ যাহার বিষে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে কিম্বা যাহার হস্তের দষ্ট স্থানের বিষ বাহুমূল অতিক্রম করিয়া স্কন্ধে চলিয়া গিয়াছে বা পায়ের দষ্ট স্থানের বিষ কোমরের উপরে উঠিয়া গিয়াছে, তাহাদের সকলেরই বিষ নামাইবার ডুরি পায়ের কোনও অঙ্গুলীতে, সাধারণতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলে, বাঁধিতে

হয়। হস্তে সর্পদংশন হইয়া থাকিলে বাহুমূল অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত হাতেরই কোনও অঙ্গুলীতে, সাধারণতঃ অঙ্গুষ্ঠা বা মধ্যমাতে বাঁধিতে হয়। বিষ বাহুমূল অতিক্রম করিবার পরেও যদি দেখা যায় যে, উহা বক্ষের দিকে, উদরের দিকে বা পৃষ্ঠের নিম্নাংশের দিকে ধাবিত তখনও হয় নাই, তাহা হইলে ঝাড়িবার কৌশলের দ্বারা (যাহা পরে বর্ণিত হইবে) বিষটুকুকে পুনরায় বাহুমূলের নীচেই ঠেলিয়া নিবার সঙ্গে সঙ্গে বিষ নামাইবার ডুরির কার্য্য হস্তাঙ্গুলিতেই চলিতে পারে। এই ডুরি সাধারণতঃ সূক্ষ্মতায় এক সূত অর্থাৎ এক ইঞ্চির অষ্টমাংশ এবং দৈর্ঘ্যে আড়াই হাত হইবে। পাট দিয়া পাকান ডুরিই প্রশস্ত।

বড়শী-গিঠ্

"বড়শী-গিঠ্" নামে পরিচিত যে গ্রন্থির পদ্ধতি আছে, বিষ নামাইবার এক সূত সূক্ষ্ম ডুরিটীর মধ্যাংশও সেই ভাবেই হস্তাঙ্গুলীতে গ্রথিত করিয়া, তৎপরে দুইজন ব্যক্তির ডুরির দুই প্রান্ত দোহন করিতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিষাচ্ছন্ন সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিষ আসিয়া এই নির্দ্দিষ্ট অঙ্গুলীটীর অগ্রভাগে না জমিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই ডুরির দোহন-কার্য্য অবিরাম চলিবে। কঠিন রোগীর চিকিৎসা দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ হয় বলিয়া দোহনকারীর হাতে ফোস্কা পড়িয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। তৎস্থলে দোহন-ক্রিয়ার অবিরাম গতি অব্যাহত রাখিবার জন্য
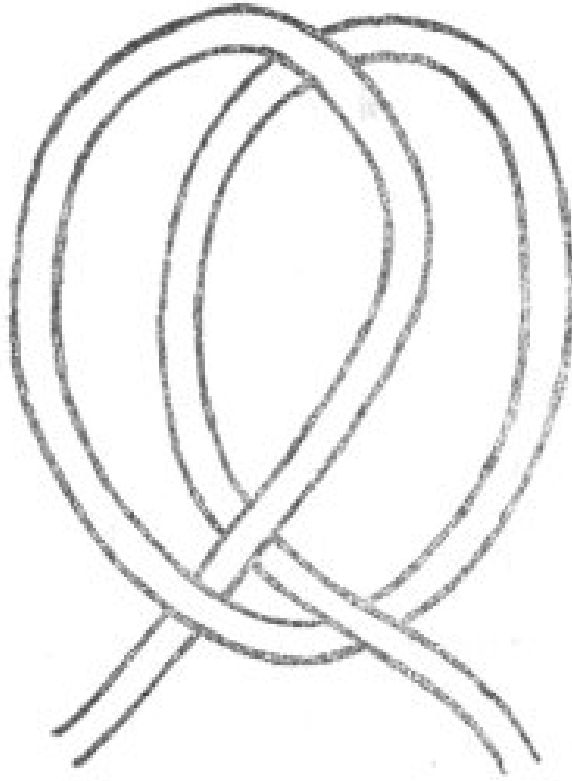
(বড়শী-গিঠ, প্রথম অবস্থায়)

প্রয়োজন মত লোক বদল করিয়া করিয়া কার্য্য চালান উচিত। এক দিকে চিকিৎসক তাহার হস্ত-কৌশলের দ্বারা বিষকে অধোগত করিবার প্রয়াস চালাইবেন, অপরদিকে দোহনকারী-
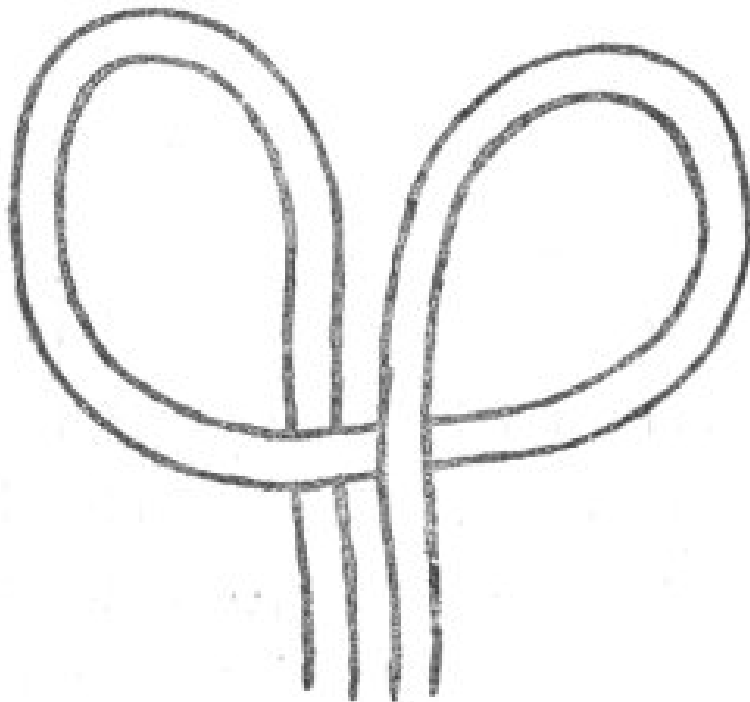
(বড়শী-গিঠ, দ্বিতীয় অবস্থায়)

দ্বয় অবিশ্রাম ডুরি দোহন করিতেই থাকিবেন,—যুগপৎ এই দুইটি কার্য্য চলিতেই থাকিবে। রোগীকে একটী জলচৌকীর উপরে বসাইয়া এই কাজ করিতে হইবে। রোগী বসিতে অক্ষম হইলে, অপরে তাহাকে ধরিয়া বসাইবেন এবং চিকিৎসার শেষ পর্য্যন্ত বা প্রয়োজনকাল পর্য্যন্ত পিছন হইতে ধরিয়া রাখিবেন।
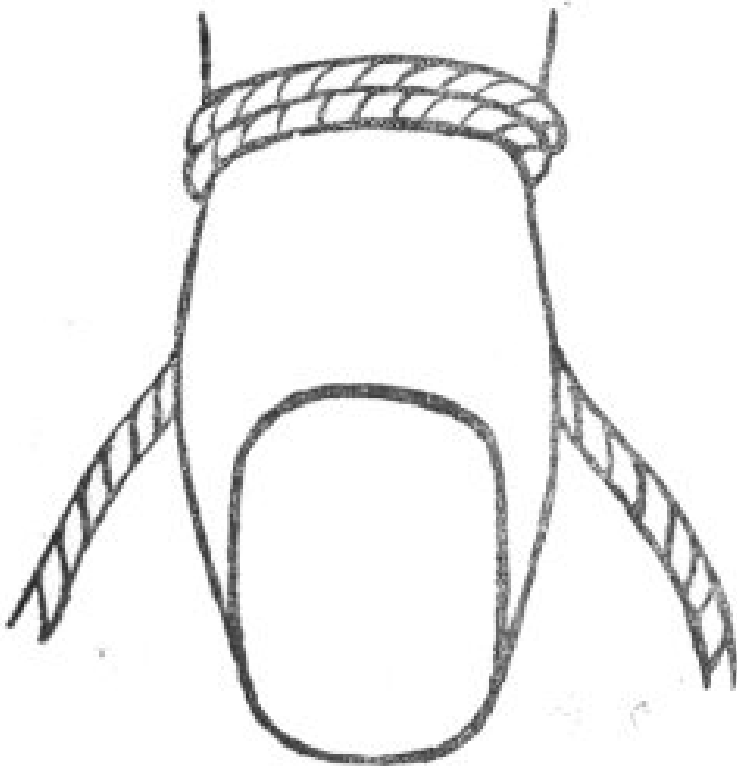
(দোহনের জন্য প্রস্তুত: বড়শী-গীঠে বাঁধা অঙ্গুলী)

পায়ের অঙ্গুলীতে ডুরি বাঁধিয়া সেই ডুরি দোহন করিলে বিষ কেন সেই অঙ্গুলীর দিকে ধাবমান হইবে, এই প্রশ্ন অনেকের মনে হইতে পারে। রেলগাড়ীতে চড়িয়া ইঞ্জিনের দিকে মাথা দিয়া শুইয়া থাকিলে অতি সহজে নিদ্রাগম হয়, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইঞ্জিনের বিপরীত

দিকে মাথা ও ইঞ্জিনের দিকে পা রাখিয়া শুইলে অনেক চেষ্টা করিয়াও নিদ্রাগম কঠিন হয়, ইহাও অনেকেই হয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, মানুষটী যদিও চলে না, তবু সচল ইঞ্জিনের গতি মানুষটীর রক্তস্রোতকে একটা নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলায় পরিচালিত করিতে সমর্থ। সর্পবিষ চিকিৎসার ব্যাপারে ডুরি-দোহনরত অপর ব্যক্তিদ্বয়ের হস্তক্রিয়াও অনুরূপ কারণেই রুগ্ন ব্যক্তির বিষাচ্ছন্ন স্থানের রক্ত-প্রবাহের গতি ডুরিবাঁধা অঙ্গুলীর দিকে পরিচালিত করিতে সমর্থ হয়।

——

ঝাড়িবার প্রণালী

পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা এই সংবাদ শ্রবণে উৎফুল্ল হইবেন কিনা জানি না, কিন্তু আমাকে বলিতেই হইতেছে। বিষ ঝাড়িয়া নামাইবার জন্য যে হস্ত-কৌশল, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে চড় মারা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

চাপট-চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক মর্ম্ম

সর্পবিষ রক্তের উষ্ণতা নিবারণ করিয়া অতি দ্রুত তাহাকে জমাইয়া ফেলে। তারই জন্য শরীরস্থ স্বাভাবিক প্রতিষেধক রস (Anti-toxin) সৃষ্ট হইয়া আর সর্পবিষের সঙ্গে লড়াই চালাইতে পারে না। রক্তের এই জমাটে ভাবকে (Coagulation) বিদ্রাবিত করিয়া দেওয়াই এই চড়ের উদ্দেশ্য। রুগ্ন ব্যক্তির শরীরের যে যে স্থানে চিকিৎসকের চড় পড়িবে,

সেই সেই স্থানের জমাট রক্ত হস্তাঘাত-হেতু উষ্ণ হইয়া চলনশীল হইবে, ফলে রক্ত হইতে বিষকে দোহন-ক্রিয়ার দ্বারা এবং চিকিৎসকের হস্ত-ঘর্ষণের দ্বারা পৃথক্ করিয়া অনায়াসে নিম্ন-গামী করা যাইবে। সর্পবিষের এই ঝাড়ন প্রক্রিয়াটী ডাইনী বুড়ীর তুকৃতাক্ নহে, ইহা এক প্রকার অভিঘর্ষণ বা ডাক্তারী ভাষায় "Massage"-ক্রিয়া মাত্র।

মন্ত্র-চিকিৎসা

ওঝারা ইহার সহিত মন্ত্র মিশাইয়া লইয়া ইহাই যে প্রকৃত চিকিৎসা, তাহা গোপন রাখিয়া বাহাদুরী লইবার গুপ্ত প্রলোভনে বা শিক্ষাদাতার উপদেশানুসারে মন্ত্রকেই প্রধান চিকিৎসা বলিয়া প্রচার করেন বা বিশ্বাস করেন। মন্ত্র-চিকিৎসার পদ্ধতিকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই কথা লিখিতেছি না বরং বর্ত্তমান পুস্তক-লেখক কি সংসার-ক্ষেত্রে, কি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে, মন্ত্রের শক্তিতে একান্তই বিশ্বাসী। কিন্তু সর্প-চিকিৎসায় মন্ত্র যে গৌণ অবলম্বন মাত্র, ঝাড়নের হস্ত-কৌশলটীই যে মুখ্য উপায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে। মন্ত্রজপ চিকিৎসকের আত্মবিশ্বাস, উদ্যম, অধ্যবসায় ও উৎসাহ প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত করে, ইহাতে কণামাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রে যাহারা অবিশ্বাসী, তাহারাও আমার নিকট হইতে এই চিকিৎসা-প্রণালী শিক্ষা করিয়া মন্ত্রের সহায়তা ব্যতীতই বহু সর্পদষ্ট রোগীর প্রাণরক্ষা

করিয়াছেন। বিশেষতঃ বটতলার পুঁথিতে শিবের জটা ছিঁড়িয়া মনসা ঠাকুরুণের পায়ে পড়িবার দিব্যি দেওয়া যে-সব মন্ত্র পাওয়া যায় এবং গ্রাম্য ওঝারা প্রায় তদনুরূপ বচনবিন্যাসসমৃদ্ধ খিচুড়ী ভাষায় রচিত অশ্লীল গালাগালি সংযুক্ত যে সকল অত্যদ্ভুত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সর্পবিষের চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাহা দ্বারা কি রোগীর, কি ওঝার, কাহারও কোনও প্রকার স্থূল বা সূক্ষ্ম মঙ্গল সাধিত হয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। আমার পিতামহ ও পিতৃদেব সর্পবিষ চিকিৎসার কালে নৃসিংহ মন্ত্র জপ করিতেন, আমার চিত্ত অসাম্প্রদায়িক রুচির অনুরোধে আমাকে ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছে। ইহা দ্বারা চিকিৎসকের যে যথেষ্ট উপকার হয়, তাহা আমার প্রত্যক্ষীকৃত অভিজ্ঞতা।

অতএব মন্ত্রবিশ্বাসীর পক্ষে হয় ইষ্টমন্ত্র অথবা কোনও একান্ত শ্রদ্ধিত মন্ত্র নতুবা গায়ত্রীমন্ত্র জপ আমি প্রশস্ত বলিয়া মনে করি। বলাই বাহুল্য, মন্ত্র-সম্পর্কিত এই প্রসঙ্গটুকু তুলিতে আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ঝাড়ণের হস্ত-কৌশলটুকুই যে সর্পবিষ প্রতিকারের আসল কথা, তাহা বলিবার প্রয়োজনেই ইহার অবতারণা করিতে হইল।

চাপটের প্রণালী

সর্পবিষের চড় সম্পূর্ণ হাতটুকু দিয়া মারিতে হয় না। একমাত্র দৃঢ়-সংবদ্ধ হস্তাঙ্গুলিগুলি দ্বারাই সর্পদষ্টের শরীরে

আঘাত করিতে হয়। সামান্য কিছুদিন অভ্যাসের ফলে এই অঙ্গুলীর চড় এমন প্রবল ভাবে পতিত হয় যে, একজন সাধারণ সুস্থ ব্যক্তির চড় খাইয়া অনেক বলশালী পালোয়ানকে মাতৃ-পিতৃ সম্বোধন করিতে হয়।
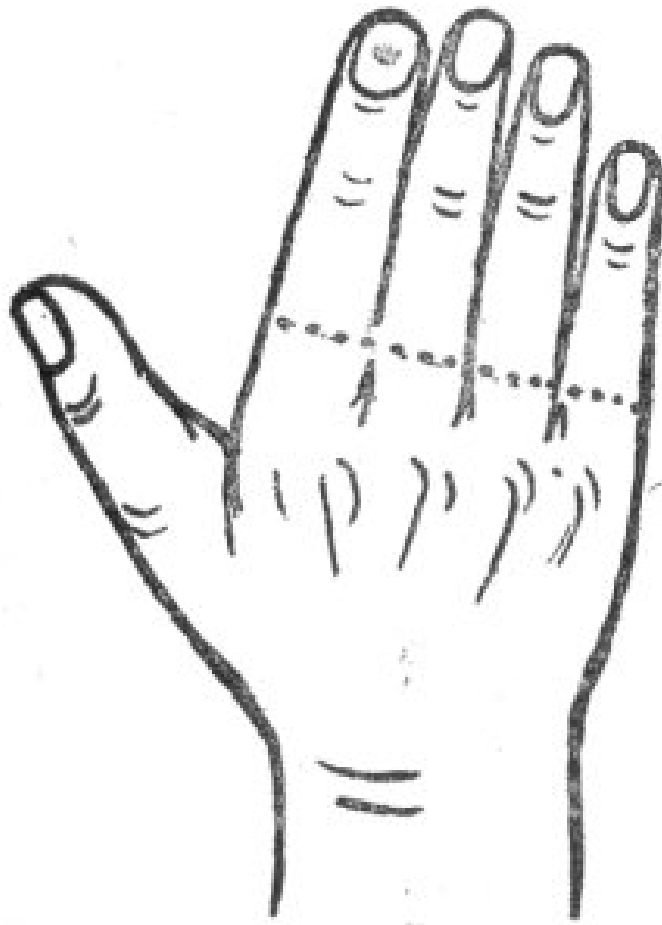
(চড় মারিবার ভঙ্গী)

[বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত অংশের উপরটুকু দিয়া চড় মারিতে হইবে]

চড়কে শক্তিশালী করিবার জন্য সমগ্র মনটাকে অঙ্গুলীর অগ্রভাগে কেন্দ্রীভূত করা আবশ্যক। এই বিষয়ে মনঃসংযোগের ক্ষমতা যাহার যত অধিক, শারীরিক শক্তির স্বাভাবিক ন্যূনতা-সত্ত্বেও তাহার চড় তত প্রবল হইয়া থাকে। আমার মনে হয়, এই মনঃ-সংযমকে সহজায়ত্ত করিবার জন্যই সর্প-চিকিৎসার

প্রথম উদ্ভাবয়িতৃগণ মন্ত্রের প্রচলন করিয়াছিলেন। মন্ত্রের ব্যবহার ব্যতীতই যিনি মনকে একেকেন্দ্রক করিতে পারেন, তাঁহার জন্য মন্ত্রের আবশ্যকতা আমি অস্বীকার করি। সামান্য অভ্যাসের দ্বারা এই হস্তকৌশল যে-কেহ আয়ত্ত করিতে পারেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইবার পূর্ব্বে বিষ ঝাড়িতে প্রবৃত্ত হইলে বিভ্রাট ও বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী। চড় মারা দুই হাতেই অভ্যাস করিতে হয়। কারণ চিকিৎসাকালে যুগপৎ দুই হস্ত দ্বারাই অতি দ্রুত বিষ নামাইতে হয়।

বিষ নামাইবার কালে ঊর্দ্ধদিক হইতে অধোদিক লক্ষ্য করিয়া অবিশ্রান্ত চড় মারিতে হয় এবং মাঝে মাঝে তাম্রখণ্ড অথবা জিকার ছালের দ্বারা বিষের সংস্থিতি নির্ণয় করিতে হয়।

বিষ যেখানে আসিয়া নামিয়াছে, তাহার সামান্য ঊর্দ্ধে, চড় মারিয়া প্রবল চাপ সহকারে অভিঘর্ষণের দ্বারা রক্ত-প্রবাহকে ভুহ্যমান ডুরির দিকে পরিচালিত করিতে হয়। এই অভিঘর্ষণ-ক্রিয়া চপেটাহত স্থান হইতে নিম্ন দিকে একফুট দেড়ফুট পর্য্যন্ত চলিবে। যাহা লিখিলাম, তাহা একটু লক্ষ্য করিয়া পড়িলে চপেটাঘাতের কৌশলটি অনেকেই বুঝিতে পারিবেন।

বিষ ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হইতে হইতে যখন হাতের কব্জা বা পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল, তখন চপেটা-ঘাতের প্রয়োজন প্রায় ফুরাইয়া যায়। তখন সম্ভবমত জোরে চপেটাঘাত করিয়া বিশেষ যত্ন-সহকারে চিকিৎসককে স্বকীয়

বৃদ্ধাঙ্গুলীর চাপের সাহায্যে রক্তস্রোতকে দোহনের দড়ির দিকে প্রধাবিত করিতে হয় এবং বারম্বার বিষের সংস্থিতি পরীক্ষা করিয়া যখন একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে, দোহনের ডুরির বোতল-গিঠের উর্দ্ধে আর এককণাও বিষ নাই, তখন দোহন বন্ধ রাখিয়া অতি দৃঢ়ভাবে বন্ধন আঁটিয়া দিতে হয়। ইহার পরেই বিষ-মোক্ষণ করিতে হয়। তদ্বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞাতব্য নিম্নে নিবেদন করিব।

উপস্থ-সন্নিকটে চাপট

এস্থলে উল্লেখ করিয়া রাখা দরকার যে, ঝাড়িবার সময় স্ত্রী বা পুরুষের উপস্থের অতি সন্নিকট স্থান শ্লীলতার অনুরোধেই অনেক চিকিৎসক ঝাড়েন না বা ঝাড়িতে পারেন না। এজন্য বিষ যদি উপস্থের সন্নিকটস্থ চর্ম্ম হইতে নিম্নগামী করিতে হয়, তাহা হইলে, যেখান পর্য্যন্ত চপেটাঘাত করিলে রোগীর বা তাহার আত্মীয়বর্গের চক্ষে বাঁধিবে না, সেইখানে সাধারণতঃ দশগুণ হইতে বিশগুণ পরিমাণ চপেটাঘাত আবশ্যক হইয়া থাকে।

কুষ্ঠ-রোগীর সর্পাঘাতের চাপট

কুষ্ঠ রোগী অত্যন্ত স্পর্শাক্রমক। এইরূপ ব্যক্তিকে সর্পে দংশন করিলে হাতে দস্তানা না পরিয়া চাপট-চিকিৎসা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এইরূপ ব্যক্তিকে অথবা যে রোগী কুষ্ঠগ্রস্ত নহে কিন্তু সংজ্ঞাহীন হইয়া গিয়াছে, তাহাকে চিকিৎসার জন্য

চাপটের পরিবর্ত্তে একখানা নূতন গামছা পাকাইয়া দড়ির মত করিয়া তাহার দ্বারা ক্রমাগত আঘাত করিয়া করিয়া চিকিৎসা করাই সঙ্গত।

বিষ-মোক্ষণ

হাতের বা পায়ের যে অঙ্গুলীতে ডোর বাঁধা হইয়াছে, কি করিয়া পদ্ধতিবদ্ধভাবে উর্দ্ধাধোগামী চপেটাঘাত করিয়া সর্ব্বশরীর-ব্যাপী সর্পবিষকে সেই অঙ্গুলীর অগ্রভাগে আনয়ন করিতে হয়, তাহা সুবিস্তারিতভাবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অঙ্গুলীর অগ্রভাগে আসিয়া বিষ জমিলেই দোহন বন্ধ করিয়া, দোহনের ডুরির বড়শী-গিঠ শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিয়া ক্রমশঃ ডুরিটী অঙ্গুলীর সম্মুখদিকে জড়াইতে জড়াইতে যখন আর জড়ান সম্ভব নহে, তখন একটি ধারাল অস্ত্র দ্বারা অঙ্গুলীর অগ্রভাগে কতিপয় ক্ষত করিয়া অঙ্গুলী-নিপীড়নে সমস্তটুকু বিষাক্ত রক্ত মোক্ষণ করিয়া ফেলিতে হয়।
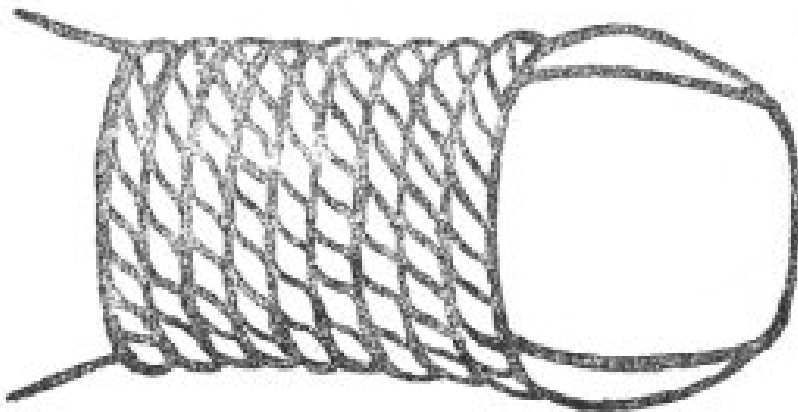
(রক্তমোক্ষণের পূর্ব্বে এই ভাবে দড়ি জড়াইতে হইবে)

বিষ-মোক্ষণে সতর্কতা

রক্ত-মোক্ষণকালে এমন কোনও ব্যক্তির পক্ষে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে, যাহার হাতে বা নখে কোনও প্রকার কণ্ডু, ক্ষত, পাঁচড়া বা যে-কোনও প্রকার চর্ম্মরোগ আছে। কারণ, ক্ষুদ্র একটি ক্ষতের সংস্রব পাইলে তাহার মধ্যবর্ত্তিতায় সর্প-বিষ রোগীর দেহ হইতে চিকিৎসকের দেহে সংক্রামিত হইতে পারে এবং পুনরায় চিকিৎসকের শরীর হইতে বিষ নামাইবার প্রয়োজন হইতে পারে, এমন কি সেই বিষ-সংক্রমণ সময়মত ধরা না পড়িলে চিকিৎসকের মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হওয়া বিচিত্র নহে। আমাকে দীর্ঘকাল ধরিয়াই ত' স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে আশ্রম-স্থাপনের প্রয়াস-ব্যপদেশে দিবসের অধিকাংশ সময়, কখনো কখনো দৈনিক প্রায় আট ঘন্টাকাল, খোন্তা-কোদাল ও দা-কুড়ালেরই শ্রম করিতে হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হাতে পায়ে ছোট ছোট ক্ষত অনেক সময়েই হইয়াছে। এজন্য রোগীর সমগ্র শরীর ঝাড়িবার পরে বিষ-মোক্ষণের ভার আমি প্রায় সর্ব্বদা অন্যের উপরেই দিয়াছি। যে রোগীর সর্ব্বশরীর চর্ম্মরোগাক্রান্ত বা যে স্থানটুকুতে চিকিৎসার প্রয়োজন, সেই স্থানটুকুতে কোনও প্রকার আঘাত-জনিত বা দূষিত ক্ষত বিরাজমান, কোন হস্ত-ক্ষত-যুক্ত চিকিৎ-সকের পক্ষে তাহাকে ঝাড়াও উচিত নহে। এজন্য প্রত্যেক চিকিৎসকেরই দুই চারিজন শিক্ষিত সহযোগী বা সাগ্‌রেদ থাকা অত্যুত্তম। নতুবা চিকিৎসক স্বয়ং বিপন্ন হইতে পারেন।

সর্পবিষ ও লবণ

বিষ-মোক্ষণ করিবার সময় সতর্ক থাকিতে হইবে যেন বিষাক্ত রক্তটুকু মাটিতে পড়িতে না পায়। কারণ, বিষাক্ত রক্তের একটি কণিকাও যদি কখনো কোনও পদক্ষতযুক্ত পথিকের পায়ে লাগে, তবে সর্পদংশন ব্যতীতই তাহার মৃত্যু হইতে পারে। যাহার পায়ে কোনও ক্ষত নাই, এমন কোনও পথিকের পায়েও সর্পবিষ ঐভাবে লাগিবার পরে দৈবাৎ কোনও কারণে তার পায়ে ক্ষত উৎপন্ন হইলে, (যথা খোলার কুচির আঘাত বা কন্টক-বেধ) তাহাতেও তাহার শরীর-মধ্যে সর্পবিষের সংক্রমণ ঘটিতে পারে। এজন্য, বিষাক্ত অঙ্গুলীটী নিপীড়নকালে বিষ-মিশ্রিত রক্তটুকুকে ধরিবার জন্য নীচে একটী কচুপাতার ব্যবহার প্রচলিত আছে। এই কচুপাতার মধ্যে একটুকু লবণ রাখিতে হয় এবং বিষাক্ত অঙ্গুলীটী মর্দ্দন-কালেও লবণ সহযোগেই তাহা করিতে হয়। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ বিষমিশ্র রক্ত লবণের স্পর্শ পাওয়া মাত্র শোণিতের বিশুদ্ধ বর্ণ প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

বিষ-মোক্ষণের অস্ত্র

বিষ-মোক্ষণের জন্য গ্রাম্য ওঝারা অনেকেই বোতল-ভাঙ্গা বা লেবু-কাঁটা অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন। কিন্তু ইহা সমর্থন-যোগ্য নহে। বোতল-ভাঙ্গায় অনাবশ্যকভাবে শরীরে কতক-গুলি ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং লেবু-কাঁটার অগ্রভাগ বিদ্ধ হইয়া ভাঙ্গিয়া রোগীর শরীর-মধ্যে রহিয়াই গিয়াছে, আর বাহির হয়

নাই, এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। এজন্য কাপড় সেলাই করিবার সূঁচকে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র মনে করি।

অস্ত্র-শোধন

সূঁচটীকে একটী দিয়াশলাইয়ের কাঠি ধরাইয়া প্রথমতঃ দগ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যক। ইহা করিলে সূঁচটীর মুখে যদিই বা কোন প্রকার দূষিত বিষ বা কোনও রোগবীজাণু থাকিয়া থাকে, তবে তাহা অগ্নিতাপে ধ্বংস হইয়া যায়।

কোনও উপদংশগ্রস্ত রোগী যে সূঁচ দ্বারা সেলাইয়ের কাজ করিয়াছে, এবং খুব সম্ভবতঃ সে সূঁচটী দুই একবার অসাবধানতা-প্রযুক্ত সেলাইকারীর হস্ত বিদ্ধ করিয়া তাহার শরীরস্থ রক্তের স্পর্শ পাইয়াছে, এমন একটী সূঁচকে অগ্নি-প্রয়োগের দ্বারা শোধিত না করিয়া তাড়াহুড়া করিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিষ-মোক্ষণ করিতে গিয়া সর্পাঘাতজনিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করা গেলেও সর্ব্বাঙ্গব্যাপী দূষিত ক্ষতরোগ হইতে তাহাকে রক্ষা করা যায় নাই,—এইরূপ ঘটনাও ঘটিতে দেখা গিয়াছে। সূঁচটি উজ্জ্বল, সুপরিষ্কৃত ও মরিচাহীন হওয়া দরকার, কেননা মরিচা-সংযুক্ত সূচীবেধের ফলে রোগী ধনুষ্টঙ্কার রোগে মারা যাইতে পারে। মোট কথা, এই ব্যাপারে গ্রাম্য অশিক্ষিত ওঝাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ না করিয়া সুশিক্ষিত চিকিৎসকদের যন্ত্র-শোধন-প্রণালী (Sterilisation) অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। আমি অধিকাংশ স্থলে সূঁচটি অগ্নিদগ্ধ করিবার পরেও পুনরায় অতিরিক্ত সাবধানতা হিসাবে অজল সুরাসার (Absolute Alcohol) ব্যবহার করিয়াছি।

দোহনের প্রথা

দোহন করিবার উদ্দেশ্যে প্রথম দোহনকারীর বাম হস্ত দোহন-রজ্জুর মূল প্রান্ত ধরিয়াছে। ক্রমশঃ হস্ত নিম্ন দিকে যাইতে থাকিবে।

দ্বিতীয় দোহনকারীর দক্ষিণ হস্ত দোহন-রজ্জুর মূল প্রান্ত ধরিয়াছে। ক্রমশঃ হস্ত নিম্নদিকে যাইতে থাকিবে।
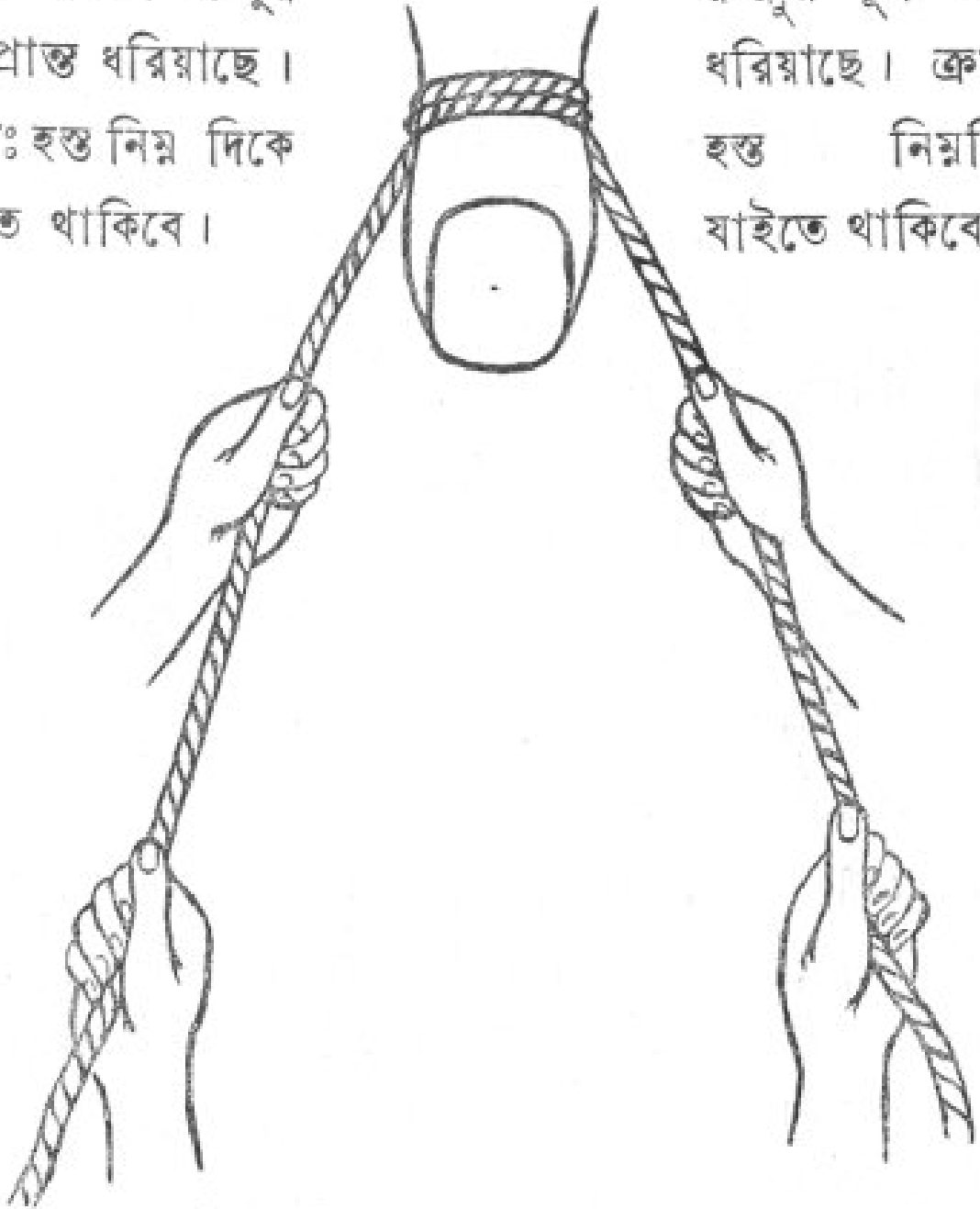
প্রথম দোহনকারীর দক্ষিণ হস্ত রজ্জুর মূল-প্রান্ত হইতে ধীরে ধীরে শেষ প্রান্তে আসিয়াছে। বাম হস্ত রজ্জুর মধ্যস্থলে।

দ্বিতীয় দোহনকারীর বাম হস্ত রজ্জুর মূল-প্রান্ত হইতে ধীরে ধীরে শেষ প্রান্তে আসিয়াছে।

আসিয়া পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ হস্ত ত্বরিত মূল প্রান্তে যাইয়া পুনরায় আস্তে আস্তে নিম্নদিকে দোহন করিতে থাকিবে।

বিষ-মোক্ষণের প্রাক্কালীন সাবধানতা

বিষ-মোক্ষণের প্রাক্কালে কিন্তু তন্ন তন্ন করিয়া তাম্রখণ্ড বা জিকার ছালের সাহায্যে একাধিকবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করা দরকার যে, দোহনের ডুরি-বন্ধনের স্থান হইতে ঊর্দ্ধে কোথাও বিষ আছে কিনা? বিষমোক্ষণের অত্যুৎসাহে এই সতর্কতা বিস্মৃত হওয়ার ফলে অনেক রোগীকে হয়ত দুই তিন ঘণ্টা পরে পুনরায় বাধ্য হইয়া চিকিৎসা করিতে হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত অহরহ দেখা যায়। মৎকথিত এই প্রণালীর প্রায় অনুরূপ প্রণালীতেই চিকিৎসা করিয়া গ্রাম্য ওঝা চলিয়া গিয়াছেন, পরে হয়ত রোগী পুনরায় সংজ্ঞাহীন হওয়াতে আমার ডাক পড়িয়াছে,—এইরূপ প্রায়ই হইতে দেখিয়াছি। যদিও তাঁহারা মন্ত্র-তন্ত্রের মায়াজাল সৃষ্টি করিয়া নিজ নিজ চিকিৎসা-পদ্ধতির মর্ম্মকথা সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে রাখিতে চাহেন, তথাপি তাঁহাদের দ্বারা পরিত্যক্ত রোগী যখন পুনরায় বিষাচ্ছন্ন হইবার পরে আমার চিকিৎসায় সম্যক্ নিরাময়ত্ব লাভ করিয়াছে, তখন ঐ সব ওঝাদের কেহ কেহ আমার সাকরেদ হইবার পরে জানিয়াছি যে, চিকিৎসার প্রণালী তাঁহাদের ভ্রমহীনই বটে

কিন্তু কেহ চপেটাঘাতটির উপযুক্ত অভ্যাস করেন নাই বলিয়া, কাহারও বা বিষ-মোক্ষণের পূর্ব্বে বিষ-সংস্থিতির পরীক্ষার ত্রুটি ছিল বলিয়া, চিকিৎসা ব্যর্থ হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, ওঝা নামধারী অধিকাংশ গ্রাম্য চিকিৎসক আত্মাভিমানের উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া রহিয়া এতই দম্ভোদ্ধত যে, অপর সর্পাঘাত-চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞান লাভ করিবার প্রবৃত্তি বা প্রয়াস তাহাদের আদৌ নাই, ফলে বিপদের সময়ে গ্রাম্য রোগী নিরুপায় হইয়া লোকচলিত প্রতিপত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের দ্বারাই চিকিৎসা করান এবং অসাবধান অজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে রোগীর যে গতি স্বাভাবিক, তাহাই লাভ করেন। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, সর্পাঘাত-চিকিৎসায় অর্থার্জ্জন নিষিদ্ধ বলিয়া, অথবা অন্য কোনও কল্পিত ভীতিবশতঃ শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদিগকে এই কার্য্যে ব্রতী করিতে ধারাবাহিক চেষ্টা করিয়াও শতকরা নিরানব্বইটি স্থলেই আমি সফলতা আহরণ করি নাই। সর্পাঘাত-চিকিৎসা সম্বন্ধে পল্লীতে পল্লীতে বক্তৃতা দিয়া এবং চিকিৎসার প্রত্যক্ষ জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বেড়াইয়াছি, আর তার ফল হইয়াছে, শুধু দিবারাত্রি নানা স্থান হইতে বিপন্ন রোগীর অফুরন্ত আহ্বান কিন্তু কোনও সর্পদষ্ট ব্যক্তির আত্মীয়কেও এই বিদ্যাটা আয়ত্ত করিতে উৎসাহিত করিতে পারি নাই। আমার পুণ্যশ্লোক পিতামহ শত শত লোককে এই বিদ্যাটা দান করিয়া যাইবার জন্য তাঁহার জীবনের সাতানব্বই বৎসর বয়স

পর্য্যন্ত কত অনুনয় বিনয় করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু চক্ষের উপরে অদ্ভুত আরোগ্য-সমূহ দর্শন করিয়াও কেহ ইহা শিখিল না, শেষে বিদ্যাটা বংশের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। আমার এই পুস্তিকা প্রচারের ফলে যদি দেশসেবাপ্রাণ যুবজনের মধ্যে ইহা শিক্ষার জন্য আগ্রহ সৃষ্ট হয়, তবে এ বিদ্যা হাতে ধরিয়া শিক্ষাদানের চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

বিষ-মোক্ষণের পরে

বিষ-মোক্ষণের পরে হাতে বা পায়ে নূতন করিয়া একটি ডোর বাঁধিতে হয়। বিষের ঊর্দ্ধগমন রুদ্ধ করিবার জন্য যে ডোর বাঁধা হইয়াছিল, তাহার সামান্য ঊর্দ্ধে এই ডোর বাঁধিতে হয় এবং পূর্ব্বডোরটি খুলিয়া ফেলিয়া সামান্য নীচে ইহা অল্পতর দৃঢ় করিয়া বাঁধিতে হয়। চিকিৎসা সাঙ্গ হইবার পরে চব্বিশ-ঘন্টাকাল পর্য্যন্ত এই ডোর দুইটি বদ্ধাবস্থাতেই রাখা উচিত। তাহার পরে খুলিয়া দিলে কোনও ক্ষতি নাই। চাপট-চিকিৎসা-কালে ও বিষমোক্ষণ-সময়ে রোগী যে ক্লেশ, শ্রান্তি ও অবসাদ বোধ করিয়া থাকে, তাহার উপশমের জন্য বেশ করিয়া তাহার চোখ, মুখ ও মাথায় জল ঢালিয়া তাহাকে শান্ত করাও বিষ-মোক্ষণের পরেই উচিত।

বিষ-মোক্ষণের পরেই রোগীকে পঁচিশটি লঙ্কার পাতা চিবাইয়া খাইতে দেওয়া হয়। লঙ্কাপাতার বিষনাশিকা কোনও শক্তি আছে কি না, তাহা পৃথক্‌ভাবে পরীক্ষা করিবার কখনও অবসর পাই নাই। কিন্তু গতানুগতিক ভাবেই আমি ইহা প্রয়োগ করিয়াছি। কিছুক্ষণ পরে পরেই রোগীকে একটু একটু করিয়া লবণ খাইতে দিতে হয় এবং তিন দিন পর্য্যন্ত দিনে দুই-বার করিয়া কাঁটানটের মূল [কুন্‌কা নটে বা ক্ষুদে কাঁটা] দেড় তোলা ও এক আনা গোলমরিচ বাটিয়া সেবন করাইতে হয়। ইহা নিয়মিত খাইলে ম্যালেরিয়াতে নাকি ধরিতে পারে না এবং দীর্ঘকাল ব্যবহারে নাকি উপদংশ-বিষও নিরাময় হইয়া থাকে। পরীক্ষার অবসর পাই নাই, তথাপি ইহা বিষনাশক বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বলিতে কি, সাধু-সন্ন্যাসীরা সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞাতকারণ রোগেই "পেনিসিলিনের" ন্যায় কাঁটানটের মূল ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাই ইহার প্রয়োগ মঙ্গলজনক বলিয়াই মনে করি। কিন্তু লবণ যে সর্পবিষনাশক, এই বিষয়ে আমি একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ। বিষ-মোক্ষণের পরে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বারে বারে মোট সাত আট তোলা লবণ সেবনের আমি পক্ষপাতি। আমার পিতামহ কি পরিমাণে লবণ সেবন করাইতেন, তাহা আমার মনে নাই। দুর্ব্বল রোগীরা অধিক লবণ সহিতে পারে না, বমনোদ্রেক হয়। এজন্য নিরাপদে যাহাকে যতটুকু লবণ সেবন করান যাইতে পারে, তাহাকে ততটুকুই দেওয়া উচিত।

বিষ-মোক্ষণের পরে দ্বাদশ ঘন্টার মধ্যে রোগীকে ঘুমাইতে দিতে নাই। সঙ্গীত, কীর্ত্তন, বাদ্যাদি বা আলাপ-আলোচনার দ্বারা তাহাকে জাগরিত রাখা কর্ত্তব্য। যদি দৈববশাৎ শরীর-মধ্যে বিষ-ক্রিয়ার সম্ভাবনা চিকিৎসকদের অজ্ঞাতসারে থাকিয়া গিয়াও থাকে, তাহা হইলে, রোগী জাগ্রদবস্থায় থাকিলে তাহার শরীরস্থ স্বাভাবিক প্রতিষেধিকা শক্তিসমূহ (Antitoxin) উদ্যত হইয়া সেই বিষ সহজে বিনাশ করিতে পারে ; এজন্যই জাগরণের ব্যবস্থা। ইহা সাবধানতার হিসাবেই অবলম্বনীয়।

বিষ-মোক্ষণের পরে তিন দিন তৈল বর্জ্জন করিয়া তৎস্থলে ঘৃত সেবন বিধেয়। ঘৃত বলিতে এখানে গব্য ঘৃতই বুঝিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদে ইহাকে "অলক্ষ্মী-পাপ-রক্ষোঘ্নং" ও "সুমঙ্গল্যং" বলা হইয়াছে। ঘৃত সর্প-বিষ, কুক্কুর-বিষ, শৃগাল-বিষ, মনুষ্য-দন্তের বিষ প্রভৃতি যাবতীয় জঙ্গম বিষেরই প্রতিষেধক এবং প্রতিকারক, ইহাতে সন্দেহ নাই।

বিষাক্ত বৃশ্চিকের দংশনক্ষেত্রেও সর্প-বিষের চিকিৎসা-প্রণালী অনুসরণ করিয়া আশু উপকার পাওয়া গিয়াছে।

নবাবিষ্কারের সম্ভাবনা

মহামতি পাস্তুর কুক্কুর-দংশনের চিকিৎসা আবিষ্কার করিয়া সমগ্র জগতের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। সর্প-বিষের সহজ

প্রতিকারের পন্থা আবিষ্কার করিয়া কেহ কি তদ্রূপ হইবেন না ? তীব্র অহিফেনসেবীদিগকে সর্পে দংশন করিলে অনেক স্থলে বিনা চিকিৎসায়ই তাঁহারা বিষের ঝোঁক সামলাইয়া নিয়াছেন, দেখা যায়। লবণ প্রয়োগ-মাত্র সর্প-বিষ-দুষ্ট কৃষ্ণবর্ণ রক্ত বিশুদ্ধ শোণিতের বর্ণ ধারণ করে, ইহাও প্রত্যক্ষ-করা ব্যাপার। এই দুই অনুমিতির উপরে নির্ভর করিয়া সূচীভেদের (Injection -এর) উপযুক্ত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ছাগ, কুক্কুর ও শশকের শরীরে প্রয়োগ করিয়া আমি নানাবিধ বিচিত্র ফলাফল পাইয়াছি। সেই সব অসম্পূর্ণ ফলাফলের উপরে নির্ভর করিয়া কোনও একটা বিশ্বাস-যোগ্য ঔষধ বা চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কার সম্ভব হয় নাই সত্য, কিন্তু ইহা যে অসম্ভব নহে, সেই ধারণা আমার বদ্ধমূল হইয়াছে। ছাগশরীরে সর্প-বিষের ক্রিয়া কুক্কুর ও শশক-শরীর অপেক্ষা অনেক মন্থর এবং অনেক মৃদু। যক্ষ্মাবীজাণুর ন্যায় সর্প-বিষকে জীর্ণ করিবার একটা স্বভাবসিদ্ধ শক্তি ছাগদেহে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যুগপৎ একই জীবের দেহে দুই অঙ্গে ঔষধ ও বিষ অনুপ্রবিষ্ট (Inject) করিয়া যে অসম্পূর্ণ ফলাফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে যদিও সঠিক কোনও ধারণা পোষণ করিতে যাওয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিরোধী হইবে, তথাপি এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, লবণ, অহিফেন, কুঁচিলা বা হরিতাল এক সময়ে লক্ষ লক্ষ মৃত্যুপথের যাত্রীকে নিমেষ-মধ্যে রক্ষা করিতে পারিবে। তন্মধ্যে লবণেরই সম্ভাবনা অধিক বলিয়া

অনুমান করিতেছি। এই সকল ভেষজের মধ্যে সর্পাহতকে রক্ষা করিবার শক্তি নিশ্চিতই আছে। শুধু আমরা জানি না, সেই শক্তিকে সঙ্কুক্ষিত করিবার উপায় কি।